সূরা আত তাওবাঃ রুকুঃ ২য় আয়াত সংখ্যাঃ (৭-১৬)

أَعُوذُ بِاللِّ مِنُ الشّيْطَانِ الرّجِيمُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَيۡفَ يَكُوۡنُ لِلۡمُشۡرِكِيۡنَ عَهۡدٌ عِنۡدَ اللّٰهِ وَ عِنۡدَ رَسُوۡلِهٖۤ اِلَّا الَّذِيۡنَ عٰهَدۡتُّمۡ عِنۡدَ الۡمَسۡجِدِ ৯ : ৭
الۡحَرَامِ ۚ فَمَا اسۡتَقَامُوۡا لَكُمۡ فَاسۡتَقِيۡمُوۡا لَهُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الۡمُتَّقِيۡنَ

৭. আল্লাহ ও তার রাসূলের কাছে মুশরিকদের চুক্তি কি করে বলবৎ থাকবে? তবে যাদের সাথে মসজিদুল হারামের সন্নিকটে তোমরা পারস্পারিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলে, যতক্ষণ তারা তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে; নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।

অর্থাৎ নবী কিনানাহ, বনী খুযাআহ ও বনী দ্বামরাহ মুশরিকদের সাথে তোমাদের চুক্তি আছে তাদের ছাড়া আর কারো চুক্তি বলবৎ থাকবে না।

অর্থাৎ হুদায়বিয়ার দিন ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাস যে চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছিল এখানে তাই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। [ইবন কাসীর] এখানে মাসজিদুল হারাম বলে পুরো হারাম এলাকা বুঝানো হয়েছে। কুরআনের সুরা আল-ফাত্হ এর ২৫ নং আয়াতেও মাসজিদুল হারাম বলে মক্কার পুরো হারাম এলাকা বুঝানো হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধি বর্তমান সৌদি আরবের মক্কা নগরীর অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে (বর্তমান শুমেইসি এলাকা) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এটি মক্কা থেকে প্রায় ৯ মাইল (১৪ কিলোমিটার) দূরে অবস্থিত। হুদায়বিয়া নামক একটি কূপ ও তৎসংলগ্ন এলাকা, মদিনা থেকে প্রায় ২৪১ মাইল দূরে অবস্থিত। আর হুদায়বিয়ার একাংশ হারাম এলাকার ভিতরে, যা সবচেয়ে নিকটতম হারাম এলাকা।

“তারাই তো কুফরী করেছিল এবং বাধা দিয়েছিল তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম হতে ও বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌছতে। আর যদি মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা না থাকত, যাদের সম্পর্কে তোমরা জান না যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে তাদেরকে পদদলিত করবে, ফলে তাদের কারণে তোমরা অপরাধী ও দোষী সাব্যস্ত হতে, (তবে অবশ্যই তিনি যুদ্ধের অনুমতি দিতেন। কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে তখন এর অনুমতি দেন নি) যাতে তিনি যাকে ইচ্ছে নিজ অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন। যদি তারা পৃথক হয়ে থাকত, তবে অবশ্যই আমরা তাদের মধ্যে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম”। আল-ফাত্হ: ২৫

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুদাইবিয়ার কাছাকাছি ছিলেন, কুরাইশরা কিনানাহ গোত্রের এক লোককে রাসূলের সাথে কথা বলার জন্য পাঠাল। সে এবং তার

সাথীরা যখন রাসূলের কাছাকাছি আসল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ হচ্ছে অমুক। সে এমন এক সম্প্রদায়ের লোক যারা হাদঈ এর পশুর সম্মান করে। সুতরাং তোমরা সেগুলোকে একত্রিত করে তার সামনে পাঠাও। সাহাবায়ে কিরাম তাই করলেন আর তারা তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে তার সামনে আসলেন। সে যখন এ অবস্থা দেখল। বলল, সুবহানাল্লাহ! এদেরকে আল্লাহর ঘর থেকে বাধা দেয়া ঠিক হবে না। তারপর সে ফিরে গিয়ে বললঃ আমি তো হাদঈর উটকে কালাদা (পশুর গলায় পশম বা চুলের মালা) পরানো ও চিহ্নিত অবস্থায় দেখেছি। আমি চাইনা তাদেরকে আল্লাহর ঘর থেকে বাধা দেয়া হোক’। [বুখারী ২৭৩২]

() কুরআন মজীদ মুসলিমদের তাকিদ করে যে, শত্রুদের বেলায়ও ইনসাফ থেকে কোন অবস্থায় যেন বিচ্যুত না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন, নগণ্যসংখ্যক মুশরিক ছাড়া বাকী সবাই চুক্তিভংগ করেছে। সাধারণতঃ এমতাবস্থায় বাছ-বিচার তেমন থাকে না। নির্দোষ ক্ষুদ্র দলকেও সংখ্যা গুরু অপরাধী দলের ভাগ্যই বরণ করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা “তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল হারামের পাশে চুক্তি সম্পাদন করেছ” বলে ওদের পৃথক করে দেয়, যারা চুক্তিভংগ করেনি এবং আদেশ দেয়া হয় যে, সংখ্যাগুরু চুক্তিভংগকারী মুশরিকদের প্রতি রাগ করে এদের সাথে তোমরা চুক্তিভংগ করোনা; বরং এরা যতদিন তোমাদের প্রতি সরল ও চুক্তির উপর অবিচল থাকে, তোমরাও তাদের প্রতি সরল থাক। ওদের প্রতি আক্রোশ বশতঃ এদের কষ্ট দেবে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টি অন্যত্র পরিষ্কার ব্যক্ত করেছেন, “কোন জাতির শত্রুতা যেন বে-ইনসাফ হতে তোমাদের উদ্বুদ্ধ না করে। [সূরা আল-মায়েদাহঃ ৮]

অনুরূপভাবে আলোচ্য সূরা আত-তাওবাহ এর ৮ নং আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ “এদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।” অর্থাৎ এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ভদ্র চিত্ত লোক চুক্তির উপর অবিচল থাকতে চায়। কিন্তু সংখ্যাগুরুর ভয়ে তারাও জড়সড়। যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি তারা কারা এটা নির্ধারণে কয়েকটি মত রয়েছে।

ইমাম তাবারী বলেন, তারা হচ্ছে, কিনানা এর বনী বকরের কোন কোন গোষ্ঠী। যারা তাদের অঙ্গীকারে অটল ছিল। কুরাইশ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যা সংঘটিত হয়েছিল তাতে তাদের কোন ভূমিকা ছিল না। কারণ নবম হিজরীতে যে সময় এ ঘোষণা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রদান করেছিলেন, তখন মক্কাতে কুরাইশ বা খুযাআতে কোন কাফের অবশিষ্ট ছিল না, আর কুরাইশ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝেও আর কোন চুক্তি অবশিষ্ট ছিল না। সুতরাং বুঝা গেল যে, তারা ছিল কিনানার বনী বকরের কিছু লোক। [তাবারী]

كَيْفَ وَ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوْا فِيْكُمْ اِلًّا وَّ لَا ذِمَّةً ؕ يُرْضُوْنَكُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ وَ ٨ : ٩
تَاْبٰى قُلُوْبُهُمْ ۚ وَ اَكْثَرُهُمْ فٰسِقُوْنَ

৮. কেমন করে চুক্তি বলবৎ থাকবে? অথচ তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না; তারা মুখে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট রাখে; কিন্তু তাদের হৃদয় তা অস্বীকার করে; আর তাদের অধিকাংশই ফাসেক।

كَيف (কেমন করে?) শব্দটি পুনরায় তাকীদের জন্য নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। إِلّ অর্থ হল আত্মীয়তা এবং ذِمَّةَ শব্দের অর্থ হল অঙ্গীকার। অর্থাৎ, সেই মুশরিকদের মুখের কথার কি দাম আছে, যাদের অবস্থা এই যে, যদি তারা তোমাদের উপর বিজয় লাভ করে, তাহলে কোন আত্মীয়তা ও অঙ্গীকার রক্ষা করবে না। কোন কোন মুফাসসিরগণের নিকট প্রথম كَيف (বাক্য) মুশরিকদের এবং দ্বিতীয় كَيف (বাক্য) ইয়াহুদীদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে। কেননা, পরবর্তী আয়াতে গুণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে। আর এই অভ্যাস ইয়াহুদীদেরই ছিল।

বাহ্যত তারা চুক্তির শর্তাবলী নির্ণয় করে কিন্তু মনে থাকে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করার কুমতলব। অভিজ্ঞতা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ দেখা গেছে, যখনই তারা কোন চুক্তি করেছে, ভঙ্গ করার জন্যই তা করেছে।তারা এমন লোক, যাদের নৈতিক দায়িত্বের কোন অনুভূতি নেই এবং নৈতিক বিধি-নিষেধ ভঙ্গ করতেও তারা কখনো কুণ্ঠিত বা শঙ্কিত হয় না।

- আল্লাহ তাআলা কাফিরদের প্রতারণা এবং তাদের অন্তরের শত্রুতা থেকে মুসলিমদেরকে সতর্ক করেছেন, যেন তারা তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব না রাখে। তারা যেন তাদের কথা ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না থাকে। তাদের কুফরী ও শিরুক তাদেরকে তাদের ওয়াদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেবে না। তারা তো সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে। ক্ষমতা পেলে তারা তোমাদেরকে জ্যান্তই চিবিয়ে খেয়ে নেবে। তারা আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করবে না এবং ওয়াদা অঙ্গীকারেরও কোন পরওয়া করবে না। তারা তাদের সাধ্যমত তোমদেরকে কষ্ট দেবে এবং এতে তৃপ্তি লাভ করবে। إِلّ (আরবী) শব্দের অর্থ হচ্ছে আত্মীয়তা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এই অর্থ বর্ণিত আছে। কবি তামীর ইবনে মুকবিল ও কবি হাসসান ইবনে সাবিতও (রাঃ) তাঁদের কবিতায় শব্দকে এই অর্থে প্রয়োগ করেছেন। আবার এর অর্থ এরূপও করা হয়েছে যে, যখন তারা বিজয় লাভ করবে তখন আল্লাহ তা'আলার প্রতিও লক্ষ্য রাখবে না এবং আর কারো প্রতিও না। এই (আরবী) শব্দটিই (আরবী) রূপ (আরবী) ও (আরবী) -এর মধ্যে এসেছে। অর্থাৎ এর অর্থ হচ্ছে "আল্লাহ।" কিন্তু প্রথম উক্তিটিই হচ্ছে বেশী স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ

মুফাসসিরেরও এটাই উক্তি। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা অঙ্গীকার বুঝানো হয়েছে। আর কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কসম বা শপথ।

اِشْتَرَوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ٩ : ৯

৯. তারা আল্লাহর আয়াতকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে ফলে তারা লোকদেরকে তাঁর পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে; নিশ্চয় তারা যা করেছে তা অতি নিকৃষ্ট।

একদিকে আল্লাহর আয়াত তাদের সৎকাজ করার, সত্য পথে থাকার ও ন্যায়নিষ্ঠ আইন মেনে চলার আহবান জানাচ্ছিল এবং অন্য দিকে তাদের সামনে ছিল দুনিয়ার জীবনের মুষ্টিমেয় কয়েকদিনের সুখ-সুবিধা-আরাম ঐশ্বর্য। প্রবৃত্তির আশা-আকাংখার লাগামহীন আনুগত্যের দ্বারা এগুলো অর্জন করা যায়। তারা এ দু' টি জিনিসের মধ্যে তুলনা করে প্রথমটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয় জিনিসটি নিজেদের জন্য বেছে নিল।

অর্থাৎ জালেমরা শুধুমাত্র হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহীকে নিজেদের জন্য বেছে নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং আরো অগ্রসর হয়ে তারা যাতে সত্যের দাওয়াতের কাজ কোনক্রমেই না চলতে পারে এবং কল্যাণ ও সৎবৃত্তির এ আওয়াজ কেউ শুনতে পায় সে জন্যও অপচেষ্টা চালিয়েছে। বরং তারা চেয়েছে, যে মুখ থেকে ডাক দেয়া হয় সেই মুখই বন্ধ করে দিতে। মহান আল্লাহ যে সত্যনিষ্ঠ ও কল্যাণময় জীবন বিধান পৃথিবীতে কায়েম করতে চাচ্ছিলেন তার পথ রোধ করার জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এ জন্য যারা এ বিধানকে সত্য জেনে এর অনুসারী হয়েছিল দুনিয়ার বুকে তাদের জীবন যাপনের দুর্বিসহ করে তুলেছিল।

“আর আমি যা নাযিল করেছি তোমরা তাতে ঈমান আন। এটা তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যতা প্রমাণকারী। আর তোমরাই এর প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। আর তোমরা শুধু আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর”.সূরা বাকারাঃ ৪১

"আমার আয়াতের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করো না" এর অর্থ এই নয় যে, বেশী মূল্য পেলে ইলাহী বিধানের বিনিময়ে তা গ্রহণ করো। বরং অর্থ হল, ইলাহী বিধানসমূহের মোকাবেলায় পার্থিব স্বার্থকে কোন প্রকার গুরুত্ব দিও না। আল্লাহর বিধানসমূহের মূল্য এত বেশী যে, দুনিয়ার বিষয়-সম্পদ এর মোকাবেলায় খুবই তুচ্ছ; কিছুই না। উক্ত আয়াতে বানী-ইসরাঈলকে সম্বোধন করা হলেও এই নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের জন্য। যে ব্যক্তি সত্যকে বাতিল, বাতিলকে প্রতিষ্ঠা অথবা জ্ঞানকে গোপন করার কাজে জড়িত হবে এবং কেবল পার্থিব স্বার্থের খাতিরে সত্য-প্রতিষ্ঠা করা ত্যাগ করবে, সেও এই ধমকের অন্তর্ভুক্ত। (ফাতহুল ক্বাদীর)

আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের নিন্দার সাথে সাথে মুমিনদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করছেন। তিনি বলছেন যে, ঐ কাফিররা নগণ্য ও নশ্বর দুনিয়াকে মনোরম ও চিরস্থায়ী আখিরাতের বিনিময়ে পছন্দ করে নিয়েছে। তারা নিজেরাও আল্লাহর পথ থেকে সরে রয়েছে এবং মুমিনদেরকেও ঈমান থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। তাদের আমল অতি জঘন্য। তারা মুমিনদের শুধু ক্ষতি করতেই চায় । তারা না কোন আত্মীয়তার খেয়াল রাখে, না চুক্তির কোন পরোয়া করে। তারা সীমালংঘন করেছে। হ্যা, তবে হে মুমিনগণ! এখনও যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদেরই লোক হয়ে যেতে পারে।

হাফিজ আবু বকর আল বাযযার (রঃ)-এর হাদীস গ্রন্থে আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি দুনিয়াকে এই অবস্থায় ছেড়েছে যে, সে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করেছে, তার সাথে কাউকে শরীক করেনি, সালাত প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দিয়েছে, সে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হলো যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন।" এটাই হচ্ছে আল্লাহর ঐ দ্বীন যা নিয়ে নবীগণ (আলাইহিমুসসালাম) এসেছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওরই তাবলীগ করতে থাকেন। তাদের এই প্রচারকার্য ছিল কথা ছড়িয়ে পড়ার এবং ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি বেড়ে যাওয়ার পূর্বে। এর সত্যতা আল্লাহর কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

অথচ মহান আল্লাহ জানিয়েছেন—

"সুতরাং যারা আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করে তারা আল্লাহর পথে জি-হাদ করুক এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জি-হাদ করবে, অতঃপর সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক, অচিরেই আমি তাকে মহা প্রতিফল দান করব।" সূরাঃ আন-নিসা : আয়াত (৭৪)

لَا يَرۡقُبُوۡنَ فِیۡ مُؤۡمِنٍ اِلًّا وَّ لَا ذِمَّۃً ؕ وَ اُولٰٓئِکَ هُمُ الۡمُعۡتَدُوۡنَ ১০ : ৯

১০. তারা কোন মুমিনের সাথে আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না, আর তারাই সীমালংঘনকারী।

فَاِنۡ تَابُوۡا وَ اَقَامُوا الصَّلٰوۃَ وَ اٰتَوُا الزَّکٰوۃَ فَاِخۡوَانُکُمۡ فِی الدِّیۡنِ ؕ وَ نُفَصِّلُ الۡاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یَّعۡلَمُوۡنَ ১১ : ৯

১১. অতএব তারা যদি তাওবাহ করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তবে দ্বীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই; আর আমরা আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করি এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা জানে।

যদি তারা তাওবা করে অর্থাৎ মূর্তিগুলো ও মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে এবং সালাতী ও যাকাতদাতা হয়ে যায় তবে (হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও। তারা তখন তোমাদেরই দ্বীনী ভাই। ইমাম বাযযার (রঃ) বলেনঃ "আমার ধারণায় (আরবী) (অর্থাৎ সে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হলো যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট) এখান থেকেই মারফু হাদীস শেষ এবং বাকী অংশটুকু বর্ণনাকারী রাবী ইবনে আনাস (রঃ)-এর কথা। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুশরিকদের উপরোক্ত ঘৃণ্য চরিত্রের প্রেক্ষিতে মুসলিমদের জন্যে তাদের সাথে চিরতরে সম্পর্কচ্ছেদ করে নেয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু না কুরআন যে আদর্শ ও ন্যায় নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার আলোকে মুসলিমদের হেদায়াত দেয়ঃ "তবে, তারা যদি তাওবাহ করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।" এখানে বলা হয় যে, কাফেররা যত শক্রতা করুক, যত নিপীড়ন চালাক, যখন সে মুসলিম হয়, তখন আল্লাহ যেমন তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করেন, তেমনি সকল তিক্ততা ভুলে তাদের ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং ভ্রাতৃত্বের সকল দাবী পূরণ করা মুসলিমদের কর্তব্য। এ শর্ত পূরণ করার ফলে তাদের উপর হাত তোলা ও তাদের জান-মাল নষ্ট করাই শুধু তোমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে না, বরং তার অধিক ফায়েদা এই হবে যে, তারা অন্যান্য মুসলিমদের সমান হতে পারবে। কোনরূপ বৈষম্য ও পার্থক্য থাকবে না।

নবী (সাঃ) বলেছেন, ''আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, লোকদের বিরুদ্ধে আমি যেন ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষী দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল। আর নামায কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে।' ' (বুখারী ঈমান অধ্যায়, মুসলিম ঈমান অধ্যায়) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যাকাত প্রদান করে না, তার নামাযও গ্রহণযোগ্য নয়।' (ঐ)

<u>এ আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে।</u>

প্রথম, কুফর ও শির্ক থেকে তাওবাহ্।

দ্বিতীয় সালাত কায়েম করা,

তৃতীয় যাকাত আদায় করা। [আইসারুত তাফসীর] কারণ,

ঈমান ও তাওবাহ হল গোপন বিষয় এর যথার্থতা সাধারণ মুসলিমের জানার কথা নয়। তাই ঈমান ও তাওবাহর দুই প্রকাশ্য আলামতের উল্লেখ করা হয়, আর তা হল, সালাত ও যাকাত। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ এ আয়াত সকল কেবলানুসারী মুসলিমের

রক্তকে হারাম করে দিয়েছে। [তাবারী; ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ যারা নিয়মিত সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করে এবং ইসলামের বরখেলাফ কথা ও কর্মের প্রমাণ পাওয়া যায় না, সর্বক্ষেত্রে তারা মুসলিমরূপে গণ্য, তাদের অন্তরে সঠিক ঈমান বা মুনাফিকী যাই থাক না কেন। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এ আয়াত থেকে অস্ত্রধারনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে সাহাবায়ে কেরামের সন্দেহ নিরসন করেছিলেন। [তাবারী]

- এখানে জ্ঞান সম্পন্ন লোক বলতে তাদের বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করার পরিণাম জানে ও বুঝে এবং তার ভয়ও তাদের মনে জাগরুক রয়েছে। তাদের জন্যই আগের কথাগুলো বলা হলো, তাদের মাধ্যমেই আয়াত ও আহকাম জানা যাবে, আর তাদের মাধ্যমেই দ্বীন ইসলাম ও শরীআত জানা যাবে। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাদের মধ্যে গণ্য করুন যারা জানে ও সে অনুসারে আমল করে। [সা’দী]

وَ اِنۡ نَّكَثُوۡۤا اَیۡمَانَهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَ طَعَنُوۡا فِیۡ دِیۡنِكُمۡ فَقَاتِلُوۡۤا اَئِمَّۃَ الۡكُفۡرِ ۙ اِنَّهُمۡ لَاۤ اَیۡمَانَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ یَنۡتَهُوۡنَ ৯ : ১২

১২. আর যদি তারা তাদের চুক্তির পর তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দ্বীন সম্বন্ধে কটুক্তি করে, তবে কুফরের নেতাদের সাথে যুদ্ধ কর; এরা এমন লোক যাদের কোন প্রতিশ্রুতি নেই; যেন তারা নিবৃত্ত হয়।

আল্লাহ তা’আলা বলেন, যে মুশরিকদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদে তোমাদের চুক্তি হয়েছে তারা যদি তাদের কসম ভেঙ্গে দিয়ে ওয়াদা ও চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে তবে তোমরা তাদের মাথা ভেঙ্গে দাও। এ জন্যেই আলেমগণ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে গালি দেবে বা দ্বীনের উপর দোষারোপ করবে কিংবা ঘৃণার সাথে এর উল্লেখ করবে তাকে হত্যা করে দিতে হবে।তাদের শপথের কোনই মূল্য নেই। তাদেরকে কুফরী, শিরক ও বিরুদ্ধাচরণ হতে ফিরিয়ে আনার এটাই পন্থা।

কাতাদা (রঃ) প্রমুখ মুরুব্বীগণ বলেন যে, কুফরীর অগ্রনায়ক হচ্ছে আবু জেহেল, উত্ব, শায়বা, উমাইয়া ইবনে খালফ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ। একদা সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) খারেজীদের একটি লোকের পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন। ঐ খারেজী সা’দ (রাঃ)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেঃ “ইনি হচ্ছেন কুফরীর অগ্রনায়ক।” তখন সা’দ (রাঃ) বলেনঃ “তুমি মিথ্যা বলছো। আমি বরং কুফরীর অগ্রনায়কদেরকে হত্যা করেছি।” হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, এর পরে এই আয়াতওয়ালাদেরকে হত্যা করা হয়নি। আলী (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। সঠিক কথা এই যে, শানে নুযূল হিসেবে এই আয়াত দ্বারা মুশরিক কুরায়েশ উদ্দেশ্য হলেও আয়াতটি ‘আম’ বা

সাধারণ। হুকুমের দিক দিয়ে তারা ও অন্যান্য সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। আবু বকর (রাঃ) সিরিয়া অভিমুকে সেনাবাহিনী প্রেরণ করার সময় তাদেরকে বলেনঃ "তোমরা তথায় এমন কতকগুলো লোককে দেখতে পাবে যাদের মাথা কামানো রয়েছে। তোমরা ঐ শয়তানের দলকে তরবারী দ্বারা হত্যা করে ফেলবে। আল্লাহর কসম! তাদের একজন লোককে হত্যা করা অন্য সত্তরজন লোককে হত্যা করা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদেরকে হত্যা করে দাও।" (এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন)

أيمان শব্দটি يمين এর বহুবচন। যার অর্থ হল কসম। أئمة শব্দটি إمام শব্দের বহুবচন, অর্থঃ নেতা বা লিডার। উদ্দেশ্য হল, যদি এই সব লোকেরা অঙ্গীকার বা চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলে আর দ্বীনের ব্যাপারে খোঁটা মারে, তাহলে প্রকাশ্যভাবে এরা কসম খেলেও এদের কসমের কোন মূল্য নেই। বরং কাফেরদের ঐ নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে লড়াই কর। সম্ভবতঃ এর ফলে তারা কুফর থেকে ফিরে আসবে।

এ থেকে হানাফী উলামাগণ দলীল গ্রহণ করে প্রমাণ করেন যে, যিম্মী (ইসলামী দেশে অবস্থানকারী অমুসলিম) যদি চুক্তি ভঙ্গ না করে দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে খোঁটা দেয় বা কুমন্তব্য করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা করা হবে না। কেননা, কুরআন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দু'টি শর্ত উল্লেখ করেছে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই দু'টি শর্ত পাওয়া যাবে তাদেরকে হত্যা করা হবে না। কিন্তু ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং অন্যান্য উলামাগণ দ্বীনের ব্যাপারে খোঁটা দেওয়া বা নিন্দা গাওয়াকে চুক্তি ভঙ্গ করা বলে গণ্য করেছেন। এই জন্য তাঁদের নিকটে দু'টি শর্তই একত্রিত হয়। অতএব এই প্রকার যিম্মী ব্যক্তিকে হত্যা করা (মুসলিম সরকারের জন্য) বৈধ; যেমন বৈধ চুক্তি ভঙ্গকারীকেও হত্যা করা। (ফাতহুল ক্বাদীর)

একথাও বলা হয়েছে যে, এ ধরনের লোকদের সাথে কেমন করে চুক্তি করা যেতে পারে? এ সাথে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছিল যে, এখন তারা কুফরী ও শিরক ত্যাগ করে নামায কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে, একমাত্র এ নিশ্চয়তা বিধান করলেই তাদের ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। এ কারণে এ আয়াতটি মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে একেবারেই দ্ব্যর্থহীন আদেশ স্বরূপ। আসলে দেড় বছর পরে হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা.) খিলাফত আমলে ইসলাম বর্জনের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল এখানে সেদিকেই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে ইতিপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَ هُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ١٣ : ٩
اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১৩. তোমরা কি সে সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং রাসূলকে বের করে দেয়ার জন্য সংকল্প করেছে? আর তারাই প্রথম তোমাদের সাথে (যুদ্ধ) আরম্ভ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? আল্লাহ্‌কে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে বেশী সমীচীন যদি তোমরা মুমিন হও।

এখান থেকে ভাষণটি মুসলমানদের দিকে মোড় নিচ্ছে। তাদেরকে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং দ্বীনের ব্যাপারে কোনো প্রকার সম্পর্ক, নিকট আত্মীয়তা ও বৈষয়িক সুবিধার কথা একটুও বিবেচনায় না আনার কঠোর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ভাষণের এ অংশটির সমগ্র প্রাণসত্তা ও মর্ম অনুধাবন করার জন্য সে সময় যে অবস্থা ও পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল তা আর একবার ভেবে দেখা দরকার। সন্দেহ নেই, ইসলাম এ সময় দেশের একটি বড় অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আরবে এমন কোন বড় শক্তি তখন ছিল না, যে তাকে শক্তি পরীক্ষার আহবান জানাতে পারতো। তবুও এ সময় যে সিদ্ধান্তকর ও চরম বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছিল স্থুল দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা তাতে অনেক বিপদের ঝুঁকি দেখতে পাচ্ছিল।

একঃ সমস্ত মুশরিক গোত্রগুলোকে একই সঙ্গে সকল চুক্তি বাতিল করার চ্যালেঞ্জ দিয়ে দেয়া, মুশরিকদের হজ্জ বন্ধ করে দেয়া, কাবার অভিভাবকের পরিবর্তন এবং জাহেলী রসম রেওয়াজের একেবারেই মুলোৎপাটন-এসবের অর্থ ছিল একই সঙ্গে সারাদেশে আগুন জ্বলে ওঠবে এবং মুশরিক ও মুনাফিকরা নিজেদের স্বার্থ ও গোত্রীয় বৈশিষ্ট্যের হেফাজতের জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত প্রবাহিত করতে উদ্ধুদ্ধ হবে।

দুইঃ হজ্জকে শুধুমাত্র তাওহীদবাদীদের জন্য নির্দিষ্ট করা এবং মুশরিকদের জন্য কাবা ঘরের পথ রুদ্ধ করে দেয়ার অর্থ ছিল, দেশের জনসংখ্যার যে একটি বিরাট অংশ তখনো মুশরিক ছিল, ধর্মীয় কাজ কর্মের জন্য তাদের কাবাঘরে আসার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু এ নয়, সমকালীন আরবের অর্থনৈতিক জীবনে কাবার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এবং কাবার ওপর আরবদের অর্থনৈতিক জীবন বিপুলভাবে নির্ভরশীল ছিল। কাজেই এভাবে কাবার দরজা বন্ধ করার কারণে তারা কাবাঘর থেকে কোন প্রকার অর্থনৈতিক সুবিধাদি লাভ করতে পারবে না।

তিনঃ যারা হোদাইবিয়ার চুক্তি ও মক্কা বিজয়ের পর ঈমান এনেছিলেন তাদের জন্য এটি ছিল কঠিন পরীক্ষার বিষয়। কারণ তাদের অনেক জ্ঞাতি-ভাই, আত্মীয়-স্বজন তখনো মুশরিক ছিল। তাদের মধ্যে এমন অনেক লোকও ছিল পুরাতন ব্যবস্থার বিভিন্ন পদমর্যাদার সাথে যাদের স্বার্থ বিজড়িত ছিল। এখন বাহ্যত আরবের মুশরিকদের গোটা সমাজ ব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন করে দেবার যে আয়োজন চলছিল তার মানে ছিল মুসলমানরা নিজেদের হাতেই নিজেদের বংশ, পরিবার ও

কলিজার টুকরাদেরকে ধুলায় মিশিয়ে দেবে এবং তাদের মান, মর্যাদা ও শত শত বছরের প্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্যসমূহ চিরতরে খতম করে দেবে।

যদিও বাস্তবে এর মধ্যে থেকে কোন একটা বিপদও কার্যত সংঘটিত হয়নি। দায় মুক্তির ঘোষণার পর সারা দেশে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠার পরিবর্তে বরং দেশের বিভিন্ন এলাকায় যেসব মুশরিক গোত্র এতদিন নির্লিপ্ত ছিল তাদের এবং বিভিন্ন আমীর, রইস ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি দল মদীনায় আসতে শুরু করলো। তারা নবী ﷺ এর সামনে ইসলাম গ্রহণ করে আনুগত্যের শপথ নিতে লাগলো। ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী ﷺ তাদের প্রত্যেককে নিজের পদমর্যাদায় বহাল রাখলেন। কিন্তু এ নতুন নীতি ঘোষণা করার সময় তার এ ফলাফলকে কেউ আগাম অনুমান করতে পারেনি। তাছাড়া এ ঘোষণার সাথে সাথেই যদি মুসলমানরা শক্তি প্রয়োগ করে তা বাস্তবায়িত করার জন্য পুরোপুরি তৈরী না হয়ে যেতো, তাহলে সম্ভবত এ ধরনের ফলাফল দেখাই যেতো না। কাজেই এ সময় মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ করার উদ্দীপনা ও আবেগ সৃষ্টি করা এবং এ নীতি কার্যকর করতে গিয়ে তাদের মনে যেসব আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল সেগুলো দূর করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এ সঙ্গে তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য তাদের কোন জিনিসের পরোয়া না করা উচিত। এ বক্তব্যই আলোচ্য ভাষণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ৯ : ১৪

১৪. তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন, তাদেরকে অপদস্থ করবেন, তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং মুমিন সম্প্রদায়ের চিত্ত প্রশান্তি করবেন,

وَ يُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوْبِهِمْ ۚ وَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ৯ : ১৫

১৫. আর তিনি তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তার তাওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

১৩-১৫ নং আয়াতের তাফসীর: আল্লাহ তা'আলা এখানে মুসলমানদেরকে পূর্ণমাত্রায় জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করে বলছেন, এই চুক্তি ও কসম ভঙ্গকারী কাফির ওরাই যারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেশান্তর করার পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল যে, তারা তাকে বন্দী করবে বা হত্যা করে ফেলবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। তারা চক্রান্ত করলো, কিন্তু আল্লাহ তাদের চক্রান্ত বানচাল করলেন এবং আল্লাহ উত্তম চক্রান্ত (বানচাল) কারী। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্ৰহণ করো না, তোমরা কি

তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ, অথচ তারা, তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? আর তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এরূপ করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ থেকে। সূরা মুমতাহিনাঃ ১

বিবাদ সৃষ্টি প্রথমে তারাই করেছে। বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে, যেই দিন তারা তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল। তাদের যাত্রীদল রক্ষা পেয়ে গেল। কিন্তু তারা দম্ভ ও অহংকারের সাথে আল্লাহর সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদর প্রান্তরে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। এর পূর্ণ ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তারা সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করতঃ তাদের মিত্রদের সাথে মিলিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। খুযাআ’ র বিরুদ্ধে বানু বকরকে সাহায্য করে। এই ওয়াদা খেলাফের কারণে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে পদানত করেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে। আল্লাহ পাক বলেন, তোমরা এই (অপবিত্র) লোকদেরকে ভয় করছো? তোমরা যদি মুমিন হও তবে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করা তোমাদের উচিত নয়। তিনি এরই হকদার যে, মুমিনরা শুধুমাত্র তাঁকেই ভয় করবে।

আর ওদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো, যেন তোমাদের উপর আমি আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে পারি, আর যেন তোমরা সঠিক পথ অনুসরণ করতে পারো। [আল-বাক্বারাহ ১৫০]

তোমরা মানুষকে ভয় কর না, আমাকেই ভয় কর। আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রি কর না। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের। সূরা মায়িদা- ৪৪

মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরয হওয়ার রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এই কাফির ও মুশরিকদেরকে যে কোন শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু হে মুমিনরা! তিনি তোমাদের হাত দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। তাদেরকে তোমরা নিজেরাই ধ্বংস করে দাও। যাতে তোমাদের মনের ঝাল ও আক্রোশ মিটে যায় এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি নেমে আসে ও প্রফুল্লতা লাভ কর। এটা সমস্ত মুমিনের জন্যে সাধারণ। মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, (আরবী) দ্বারা খুযাআ গোত্রকে বুঝানো হয়েছে যাদের উপর কুরায়েশরা সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের মিত্রদের সাথে মিলিত হয়ে আক্রমণ চালিয়েছিল। (আরবী)-এর সর্বনামটিও তাদেরই দিকে প্রত্যাবর্তিত।

ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন। যে, আয়েশা (রাঃ) যখন রাগান্বিত হতেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর নাকটি ধরে নিতেন এবং (আদর করে) বলতেন- হে উওয়ায়েশ! এ দু'আটি পাঠ করঃ (আরবী) অর্থাৎ "হে আল্লাহ! নবী মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমার অন্তরের ক্রোধ দূর করুন! আর আমাকে বিভ্রান্তিকর ফিতনা থেকে রক্ষা করুন।" ঐ আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যকার যার প্রতি ইচ্ছা হয় তার তাওবা কবুল করে থাকেন। বান্দাদের জন্যে কল্যাণকর কি তা তিনি ভালরূপেই জানেন। তিনি তাঁর সমস্ত কাজ-কর্মে, সমস্ত শরঈ বিধানে ও সমস্ত হুকুমকরণে অতি নিপুণ ও বিজ্ঞানময়। তিনি যা চান তাই করেন এবং যা ইচ্ছা করেন তাই নির্দেশ দেন। তিনি ন্যায় বিচারক ও হাকিম। তিনি অত্যাচার করা থেকে পবিত্র। তিনি অণু পরিমাণও ভাল বা মন্দ নষ্ট করেন না, বরং তার প্রতিদান দুনিয়ায় ও আখিরাতে দিয়ে থাকেন।

اَمۡ حَسِبۡتُمۡ اَنۡ تُتۡرَکُوۡا وَ لَمَّا یَعۡلَمِ اللّٰہُ الَّذِیۡنَ جٰہَدُوۡا مِنۡکُمۡ وَ لَمۡ یَتَّخِذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ وَ ১৬ : ৯
لَا رَسُوۡلِہٖ وَ لَا الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَلِیۡجَۃً ؕ وَ اللّٰہُ خَبِیۡرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ

১৬. তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে অথচ এখনও আল্লাহ প্রকাশ করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ ছাড়া অন্য কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি? আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুমিনগণ! এটা সম্ভব নয় যে, আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দেবো, অথচ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো না ও দেখবো না যে, তোমাদের মধ্যে ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী ও কে মিথ্যাবাদী। 'ওয়ালিজাহ' (وَلِیۡجَۃً) শব্দের অর্থ হচ্ছে রহস্যবিদ ও দখলদার।

আক্ষরিক ও পারিভাষিক অর্থ: আরবি ভাষায় 'ওয়ালিজাহ' বলতে এমন গভীর বা অন্তরঙ্গ বন্ধু, অভিভাবক কিংবা বিশ্বস্ত উপদলকে বোঝায়—যাদের সাথে মানুষ ঘরের ভেতরের বা অন্তরের গোপন রহস্য শেয়ার করে

সুতরাং ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী ঐ ব্যক্তি যে জিহাদে আগে বেড়ে অংশ নেয় এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর মঙ্গল কামনা করে ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। এক প্রকারের বর্ণনা দ্বিতীয় প্রকারকে প্রকাশ করে দিচ্ছিল, তাই দ্বিতীয় প্রকারের লোকদের বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা ছেড়ে দিয়েছেন। এরূপ বর্ণনারীতি কবিদের কবিতাতেও পরিলক্ষিত হয়।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষায় নিপতিত করা হয় নবীদেরকে, তারপর সৎকর্মপরায়ন বান্দাদেরকে, তারপর তাদের অনুরূপ,

তারপর তাদের অনুরূপদেরকে। প্ৰত্যেক মানুষকে তার দ্বীনদারী অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি দ্বীনদারী বেশী হয় তাকে বেশী পরীক্ষা করা হয়। [তিরমিযীঃ ২৩৯৮, ইবনে মাজহঃ ৪০২৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "লোকেরা কি এটা ধারণা করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি একথা বললেই তারা অব্যাহতি পেয়ে যাবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি ঐ লোকদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম যারা তাদের পূর্বে অতীত হয়ে গিয়েছে, সুতরাং আল্লাহ ঐ লোকদেরকে জেনে নিবেন যারা সত্যবাদী ছিল এবং তিনি মিথ্যাবাদীদেরকেও জেনে নিবেন। আনকাবুতঃ ২-৩

যে অবস্থায় একথা বলা হয় তা ছিল এই যে, মক্কা মু 'আয্যামায় কেউ ইসলাম গ্ৰহণ করলেই তার ওপর বিপদ আপদ ও জুলুম-নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তো। এ পরিস্থিতি যদিও দৃঢ় ঈমানের অধিকারী সাহাবীগণের অবিচল নিষ্ঠার মধ্যে কোন প্রকার দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করে নি তবুও মানবিক প্রকৃতির তাগিদে অধিকাংশ সময় তাদের মধ্যেও চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যেতো। এ ধরনের অবস্থার একটা চিত্র পেশ করে খাব্বাব ইবনে আরত বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেন, 'যে সময় মুশরিকদের কঠোর নির্যাতনে আমরা ভীষণ দুরবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলাম সে সময় একদিন আমি দেখলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা 'বাঘরের দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছেন। আমি সেখানে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি কি আমাদের জন্য দো 'আ করেন না? একথা শুনে তাঁর চেহারা আবেগে-উত্তেজনায় রক্তিমবর্ণ ধারণ করলো এবং তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্বে যেসব মুমিনদল অতিক্রান্ত হয়েছে তারা এর চাইতেও বেশী নিগৃহীত হয়েছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে বসিয়ে দেয়া হতো এবং তারপর তার মাথার ওপর করাত চালিয়ে দু' টুকরা করে দেয়া হতো। কারো অংগ-প্রত্যংগের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুনী দিয়ে আঁচড়ানো হতো, যাতে তারা ঈমান প্রত্যাহার করে। আল্লাহ্‌র কসম, এ কাজ সম্পন্ন হবেই, এমন কি এক ব্যাক্তি সান 'আ থেকে হাদ্বারামাউত পর্যন্ত নিঃশংক চিত্তে সফর করবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ভয় তার মনে থাকবে না।" [বুখারীঃ ৩৬১২, মুসনাদে আহমাদঃ ৫/১০৯]

আর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ বিষটিকেই (আরবী) এই শব্দে বর্ণনা করেছেন।

অন্য একটি আয়াতে রয়েছে (আরবী) অর্থাৎ "আল্লাহ এরূপ নন যে, তিনি মুমিনদেরকে তোমাদের এ অবস্থাতেই ছেড়ে দিবেন এবং কে কলুষিত ও কে পবিত্র তা পরীক্ষা করে পৃথক করবেন না।" (৩:১৭৯) সুতরাং শরীয়তে জিহাদের বিধান দেয়ার এটাও একটা হিকমত যে, এর দ্বারা ভাল ও

মন্দের মধ্যে পার্থক্য ও তারতম্য হয়ে যায়। যদিও আল্লাহ সবকিছুই অবগত আছেন, যা হবে সেটাও তিনি জানেন, যা হয়নি সেটাও জানেন, আর যখন হবে তখন ওটা কিভাবে হবে সেটাও তিনি অবগত রয়েছেন। কোন কিছু হওয়ার পূর্বেই ওর জ্ঞান তার থাকে এবং প্রত্যেক জিনিসেরই অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। তবুও তিনি দুনিয়াতেও ভাল-মন্দ এবং সত্য ও মিথ্যা প্রকাশ করে দিতে চান। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদও নেই এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালকও নেই। তাঁর ফায়সালা ও ইচ্ছাকে কেউই পরিবর্তন করতে পারে না।